উৎসর্গ

যে মানুষটির সাথে ছিল না কোনো রক্তের সম্পর্ক। চিনতেন না আমাকে, আমার পূর্বপুরুষকে। তারপরও তিনি আমার জন্য কেঁদেছেন। আমার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেছেন। কেয়ামতের কঠিন দিনেও তাঁর সুপারিশধন্য হতে চাই। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মেহরিমা

সূচিপত্র

সভ্যতার ছায়ায় অসভ্য জাতি ০৯
ধোঁকাফুল ২৫
ভিন্নরঙা খুন ৩৬
নারী কেন শ্রমজীবী নন? ৪৭
শিক্ষিত হয়ে তবে করবটা কী? ৫৬
নবিজির বিদায়ি ভাষণে আমাদের শিক্ষা ৬৪
নারীঅধিকার : ধোঁয়াশা বনাম বাস্তবতা ৭৬
সে যুগের রমণী ৮৪
ইসলাম নারীকে প্রতিবন্ধী করেছে? ৯১
কৃতজ্ঞতা ৯৭

সভ্যতার ছায়ায় অসভ্য জাতি

প্রথম দিন

দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ভার্সিটির লাইব্রেরি। নিঃশব্দে পায়চারি করছে মেহরিমা, সাথে ছোটবেলার বান্ধবী এবং ভার্সিটির ক্লাসমেট নুজাইরা। এক এক করে বইগুলো নেড়ে দেখছে। সেলফগুলো পুরোনো হতে হতে পোকামাকড়ের খাবারে পরিণত হয়েছে। নতুন সেলফ আনার কসরত চলছে। একদুটো চলেও এসেছে। নতুন কিছু বইও সংযুক্ত হয়েছে। সেখানেই হাতড়াচ্ছে ওরা। হঠাৎই একটি বই সেলফ থেকে পড়ে গেল। বসে বইটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মেহরিমা; আলগোছে মুছে বইটি রেখে দিলো সেখানটিতেই। আবারও ব্যস্ত হয়ে গেল জ্ঞানের সুবিশাল এ ভান্ডারে; অসীম এক তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টায়। কী ভেবে যেন কিছুক্ষণ আগে রাখা বইটি আবারও হাতে নিল। এদিক-সেদিক করে কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখল। মুচকি হাসল, পরক্ষণেই এন্ট্রি করে নুজাইরাকে নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্লাসরুমের উদ্দেশে।

ক্যাম্পাসের বিশাল মাঠ পেড়িয়ে চলল মেহরিমা ও নুজাইরা। সেই স্কুল থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। কলেজ পেরিয়ে ভার্সিটিতে এসেও একই ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে। সব মিলিয়ে জীবনের বৃহৎ একটা সময় ওরা একসাথেই কাটিয়েছে।

মেহরিমার হাঁটার গতি খুবই শ্লথ। ছোট ছোট কদম ফেলে হাঁটে ও। হাঁটার সাথে চলছে ওদের চিন্তা-দর্শন-আলাপন। গুরুগম্ভীর এসব আলাপের মাঝে সহজ-সরল কিছু আলাপও স্থান করে নেয় সেখানে। এই যেমন ভার্সিটির নতুন অনেক মুখের কথা, পূর্বের অনেক পরিচিত আপনজনের কথা। আলাপ করে নতুন শহরের কথা, নতুন অভিজ্ঞতা ও তার হরেকরকম উপাদানের কথা। তার কিছুটা অংশ নিজের করে নেয় নাজনিন। ওদের নতুন শহরের নতুন বান্ধবী।

মেয়েটা বেশ লাজুক; পড়ালেখায়ও বেশ মনোযোগী। তবে ওর কথায় কথায় কেমন যেন রহস্যের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এটাই হয়তো ওর বিশেষত্ব। সব কিছুর মাঝে ওর জানার আগ্রহ প্রচুর। সত্যমিথ্যার তফাৎ বুঝতে পারে। গল্প করতে বেশ আরামই লাগে। এককথায় মনোযোগী শ্রোতা যাকে বলে।

গতকালের কথা। ক্যান্টিনে বসে নাজনিন বেশ চাঞ্চল্যকর কথা বলছিল। ওর মতে ইসলামের সাথে নাকি পশ্চিমা রীতিনীতির অনেক মিল। ইসলাম থেকেই নাকি ওসব ধার করেছে ওরা, আবার ইসলামও নাকি পশ্চিমাদের অনেক রীতিনীতি পালনের অনুমোদন দিয়েছে। নাজনিন বলে চলল, আব্বু বলেছেন, গণতন্ত্র অনেকটাই হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুপূর্ব খলিফা নির্বাচন শুরা কমিটির মতো। ব্যাপারটা নিয়ে নাজনিন বেশ উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করে।

মেহরিমা নাজনিনের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। বর্তমান বৈশিক জীবনব্যবস্থা মুসলিমদের প্রতিকূলে। বলা যায়, মুসলিমরা এখন কোণঠাসা হয়ে আছে নিজেদেরই অপরিণামদর্শিতার কারণে। তাই মুসলমানদের অনেকেই পশ্চিমা মতবাদের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়াকেই উত্তম সিদ্ধান্ত মনে করছে। পশ্চিমাদের প্রচারণার ফাঁকফোকর তাদের চোখে খুব সহজেই ধরা পড়ে না। নাজনিনের ব্যাপারটাও এর ব্যতিক্রম নয়।

মেহরিমা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নাজনিনের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে, যেগুলো বাদ দিয়ে পুরো বিষয়টা সরলরেখায় বর্ণনা ঠিক হবে না। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ধারিত শুরা কমিটির অধিকাংশের রায়ের ওপর নির্ভর করে খলিফা নির্বাচন আর ভোটতন্ত্রের মাঝে তফাতটা আকাশপাতাল। সেই শুরা কমিটির প্রতিটি সদস্য ছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এতটাই উত্তম ও যোগ্য ছিলেন তারা—তাদের প্রত্যেকেই গোটা মুসলিম জাহানের শাসক হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন; আর তাদের অবস্থা এমন ছিল, তাদের মধ্যে যে কারও শাসক হওয়ার অনুমোদন ছিল—যদি তার পক্ষে অন্যদের ভোটের আধিক্য থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে? এখানে তো আইনজীবী, বিচারক, শিক্ষক, ছাত্র, চোর, ডাকাত, ঋণখেলাপি—সবার ভোট সমান। জ্ঞানীর কোনো বিশেষ মূল্য এখানে নেই। জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত আর মূর্খের সিদ্ধান্তের মাঝে কোনো তফাত নেই। আর ইসলামের শুরা ব্যবস্থায় ভোটাধিকার ছিল

শুধুই জ্ঞানীদের। জ্ঞানীরা যার মাঝে কল্যাণ দেখতেন, তাকেই নেতা বানাতেন। আর এটাই জ্ঞানী-শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উত্তম অবস্থান ছিল।

নাজনিন, দেখ একটা বিষয়। একজন জ্ঞানী মানুষ সমাজের জন্য ভালো চিন্তা বেশি করতে পারবে নাকি মূর্খ? অবশ্যই জ্ঞানী মানুষ। তাহলে বল, একজন জ্ঞানী আরেকজন পাগল কীভাবে সমাজের অভিভাবক নির্বাচনে সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে?

নাজনিন চিন্তিত মনে তাকিয়েছে মেহরিমার দিকে। ওর দৃষ্টিই বলে দেয়—মেহরিমার কথা ওর হজম হয়নি। পাশ থেকে নুজাইরা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পেরেছিস?' নাজনিন ভাবুক ভাবুক স্বরে বলল, 'ভাবছি; তোর কথায় তো যুক্তি আছে।' মেহরিমা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। নুজাইরার চোখ ঘড়ির কাঁটায় আটকে গেল—এই চল, ক্লাসের সময় হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় দিন

নাজনিন আজ ক্লাসে আসেনি। বাসায় ওর ছোট চাচা বেড়াতে এসেছেন স্বপরিবারে। তাই একদিনের ক্লাস ফাঁকি। নুজাইরাটাও আসেনি আজ। কেমন একলা একা অনুভব করে মেহরিমা।

এসব ভাবতে ভাবতেই দুপুর থেকে বিকেল। কোনোমতে ক্লাসগুলো শেষ করে। ক্লাস শেষে বিকেলে নিয়মতান্ত্রিক লাইব্রেরিতে যায় মেহরিমা, সেখান থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে। এরপর বাড়ি ফেরার পালা। রিকশায় বসে মেহরিমার ভাবনা স্নাত হয় হাজারো ভাবনায়। ভাবনাজুড়ে ভাঙনের সুর, সে সুর মিশেছে সুদূর আন্দালুস, বোখারা আর মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি বিন্দুজুড়ে।

শতবছর যাবৎ মুসলমানরা খেলাফত হারিয়ে ভঙ্গুর এক সমাজবিধান নিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে গ্রহণ করেছে মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়কে। জেঁকে বসেছে নিজেদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য জাতি ঘোষণা করে অসভ্যতার ফেরি করা পশ্চিমা সভ্যতা। আমাদের ওপর ওরা এতটাই বিজয়ী হয়েছে যে, আমরা নিজেদেরকে ওদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। তাদের সাথে

নিজেদের সামান্য সদৃশ পেয়ে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি, অথচ এ কেবলই ধোঁকার নগরী। আলেয়ার পিছু ছোটা।

মেহরিমার ভাবনায় নাজনিনের ছবি অঙ্কিত হয়। ওরই-বা কী দোষ, ওকে ওর চারপাশ এমনটা ভাবতে বাধ্য করেছে। চারপাশের মানুষের পশ্চিমা দর্শনপ্রীতি কাবু করেছে ওর মনস্তত্ত্ব।

তৃতীয় দিন

লাঞ্চ করবি না?

নাজনিনের কথায় পিছনে ফিরে তাকায় মেহরিমা। বেশ ফুরফুরেই লাগছে ওকে। এমনিতেও মনে হয় না কখনো চিন্তিত থাকে ও। হাসাহাসি, ঠাট্টা-মশকরা, একগাল হাসি আর কথায় কথায় একঝাঁক রহস্য সে ললাটে লেপ্টে রাখে। নাজনিনের ডাক শুনেই ওর এত শত রূপ ভেসে ওঠে মেহরিমার মনে।

এখানে বস!

মেহরিমার কথায় বোকাসোকা মুখ করে বসে নাজনিন। মেহরিমার মুখে এখনো হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে আছে। দুজন তাকিয়ে আছে যার যার সামনের দিকে। কিছুক্ষণ পর খানিক হেসে নিল দুজনেই।

নাজনিন : তুই পরশু কী যেন বলছিলি! কাল তো ক্লাসেই এলাম না। তাই আর কথা হলো না। এখন বল তো শুনি কী বলছিলি!

মেহরিমা : তোর ধৈর্য হবে তো?

নাজনিন : ধৈর্যের কোনো কমতি নেই আমার। তুই বলা শুরু কর!

মেহরিমা : আচ্ছা শোন তাহলে, গণতন্ত্র এবং খেলাফত দুটি বিষয় যে কোনোভাবেই এক নয়, একটি যে অন্যটির সাংঘর্ষিক, এটা বোঝার জন্য আমাদের যেতে হবে হাজার বছর পেছনের গল্পে। এ গল্প কলঙ্কের, এ গল্প পাশ্চাত্যের পশুত্বের। যেহেতু ইতিহাসের গপ্প করব, তাই খুব ধীরেসুস্থে বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

দেখ, তোর জন্য ডায়েরিতেও নোট করে রেখেছি। কোনো কিছু না বুঝলে বলিস, রিপিট করব। শোন তাহলে—

খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীকে প্রাচীন গ্রিসের প্রারম্ভকাল হিসেবে ধরা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্ম নেন গ্রিসের বেশ কজন বিখ্যাত দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। যেমন : পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭), সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯), প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭), অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) এবং এপিকিউরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০)।

এ সকল দার্শনিকের মাধ্যমে গ্রিসে সৃষ্টি হয় দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদের এক নয়া প্লাবন। একই সাথে ফুলে-ফেঁপে ওঠে ধর্মদ্রোহিতাও। সমাজের এলিট শ্রেণি ধর্ম সংস্কারের জোর দাবিও ওঠাতে শুরু করে। পশ্চিমে সে সময়টা এমন হয়ে গিয়েছিল—যেকেউ আপন ধর্মকে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করতে পারত।

খ্রিষ্টপূর্ব ২১৪ সন থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৬ সন পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের সাথে গ্রিস প্রজাতান্ত্রিক সরকারের যুদ্ধ চলমান থাকে। ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বে চতুর্থ ম্যাসেডোনিয়া যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে গ্রিক প্রজাতন্ত্র রোমান সাম্রাজ্য অধিকার করে।

খেয়াল কর, খ্রিষ্টপূর্ব সপ্ত শতাব্দীতে গ্রিসে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। অর্থাৎ, প্রজাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পূর্ব থেকেই পশ্চিমে চলে আসছে। এজন্য গণতন্ত্রের এই সুরতকে কখনোই ইসলাম থেকে ধারকৃত বা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলা যায় না।

আচ্ছা, এরপর দেখ, রোমান সাম্রাজ্য জয়ের ফলে গ্রিস প্রতিপত্তি রোমান সভ্যতার ওপর প্রভাব ফেলে। আস্তে আস্তে রোমান সভ্যতায় গ্রিক সভ্যতা মিশে যায়। কারণ, জানিসই তো, পরাজিতরা সব সময় বিজিতদের আদর্শ অনুসরণ করে। রোমানরাও তাই করল।

রোমানরা গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা গ্রহণ না করলেও অন্য গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করতে শুরু করল—বেছে বেছে, সুবিধামতো। গ্রিক সভ্যতার সংমিশ্রণে রোমান সভ্যতা তখন এমন এক সভ্যতায় পরিণত হলো, যার মৌলিক অংশ হয়ে গেল বিলাসিতা এবং মনচাহি জিন্দেগি।

মনুষ্য প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করে তৈরি সংবিধানের ওপর চলতে থাকে রোমান সাম্রাজ্য। একের পর এক ক্ষমতাগ্রহণ এবং ক্ষমতাচ্যুটির ঘটনার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এসে পৌঁছে রোমান সাম্রাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যকে তখন চার ভাগে ভাগ করে চার জন শাসক নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহের অবসান ঘটেনি।

পশ্চিমা বিশ্বে মহান কনস্টান্টিন নামে খ্যাত প্রথম কনস্টান্টিন (২৭৩-৩৩৭) খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্রোহ দমন এবং বাকি শাসকদের পরাজিত করে 'কনস্টান্টিনোপল'-কে রাজধানী করে রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। একে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যও বলা হয়। প্রথম কনস্টান্টিন ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সময় তিনি রোমান সভ্যতাকে পাশ কাটিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টধর্মকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। রোমান সভ্যতা তখন আস্তে আস্তে খ্রিষ্টীয় রীতিনীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। একসময় রোমান সাম্রাজ্যে গড়ে ওঠে খ্রিষ্টবাদ এবং পোপতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হিসেবে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মূল রোমান সাম্রাজ্য অর্থাৎ, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে প্রবেশ করে রোমান সাম্রাজ্য। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তখন হয়ে ওঠে রোমান সভ্যতার ধারকবাহক।

মধ্যযুগকে ভিন্ন অর্থে পশ্চিমারা অন্ধকার যুগ বলে থাকে। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়—মধ্যযুগে পোপদের ক্ষমতায়ন বেড়ে যাওয়া, প্লেটো-অ্যারিস্টটল দর্শনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটা। কতিপয় ধর্মীয় গুরু তাদের রীতি অনুসরণ করে যুক্তিবিদ্যার দাবিতে তাদের কথাকে ধর্মের স্থানে সমাসীন করা। তাদের বিরোধিতাকে ধর্মের বিরোধিতা হিসেবে সাব্যস্ত করা। আর সেজন্যই এ যুগকে পশ্চিমারা অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

এ যুগে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মুসলিম বিশ্বের। ক্রুসেডের নামে মুসলিম বিশ্বে বারবার নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় পশ্চিমাদের ক্রুসেডবাহিনী। এ সময়টাতে মুসলিম উম্মাহর কান্ডারি ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। তাদের বিজয়ধ্বনি তখন বিশ্বের আনাচেকানাচে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে ইতিহাস

রচিত হয়েছিল সে সময়। ১৪৫৩ সনে তুর্কি মুসলিম সালতানাতের কাছে পরাজিত হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। আর এর মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটে মধ্যযুগ বা পশ্চিমাদের ভাষায় অন্ধকার যুগের।

মেহরিমা : কিছু বুঝলি?

নাজনিন : হ্যাঁ, তবে বেশ জটিল। বল, তারপর কী হলো?

মুচকি হেসে পুনরায় বলতে শুরু করে মেহরিমা—

চল গল্পের একটু পিছনে ফিরে যাই। যে সময়টাতে রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল, পশ্চিমাদের মতে যাকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। ঠিক তখন চলছিল মুসলিম বিশ্বের সোনালি যুগ, মুসলিমদের বিজয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আরব-রোম-পারস্য-আফ্রিকা-স্পেন একের পর এক জয় করে মুসলমানরা নিজেদের শক্তিমত্তার প্রমাণ দিচ্ছিল তারা। হাজার বছরের ইতিহাস আর বাস্তবতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রমাণিত করেছিল নিজেদের। সেই স্বর্ণালি সময়টাতে কিছু আগাছাও জন্ম নিয়েছিল মুসলিম বিশ্বে। গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু নয়া মতবাদ। তাদের মধ্যে 'মুতাজিলা' সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনুর রশিদের যুগে পশ্চিমা দার্শনিকদের বইগুলো মুসলিম বিশ্বে অধিকহারে অনূদিত হয়ে লাইব্রেরিগুলোতে সজ্জিত হতে শুরু করে। মুতাজিলা সম্প্রদায় তখন সেসব পশ্চিমা দর্শন থেকে নিজেদের একটি ভিত্তি খুঁজে পায় এবং তাদের বিশ্বাসকে সেই ধাঁচে গড়ে তোলে। আর এভাবেই পশ্চিমা দর্শনের ভিত গড়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বে।

ওয়াসেল বিন আতা ছিল মুতাজিলাদের নেতা। সে ছিল বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র। কিন্তু একবার তাঁর সাথে এক দ্বন্দ্বের কারণে মসজিদের ভিন্ন দিকে অবস্থান নেয় ওয়াসেল। পৃথকভাবে নিজ মতাদর্শের প্রচার চালাতে শুরু করে। তখন হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'ইতাজালা আন্নি'। অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তখন থেকেই তার মতবাদকে মুতাজিলা বলা হয়।

এই মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্য দর্শন। সেজন্য দর্শনের শ্রেণিবিন্যাসে মুতাজিলাদের মাঝেও ভিন্ন ভিন্ন দল গড়ে ওঠে। তবে তাদের মূলে কয়েকটি বিশ্বাস ছিল এক। সেগুলো ছিল পাশ্চাত্যের যুক্তিবিদ্যার রঙে রঙিন। আকলকে সব কিছুর মূল ধরে তারা ইসলামকে বিচার করত। তাদের ধারণামতে, ভালোমন্দ সব কিছুই আকলের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, ভালো কাজ করা, মন্দকে পরিত্যাগ করা মানুষের আকলগত কাজ। তাদের মতে যেকোনো কাজ বান্দার আকলে ভালো হওয়া আবশ্যক, যদিও তা আল্লাহর নিকট ভিন্ন হয়।

চল তাদের এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদাগুলোর মাঝে মোটাদাগের পার্থক্যগুলো তুলে ধরা যাক—

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত : আল্লাহ তাআলা সত্তাগত একক। তার বরাবর কেউ হতে পারে না। তার সমস্ত গুণাবলির সাথে তিনি চিরস্থায়ী। তার সদৃশ কেউ নেই। তিনি কর্মগতও একক। অর্থাৎ, তার কোনো অংশীদার নেই।

মুতাজিলা : আল্লাহ তাআলা তার অস্তিত্বে এভাবে একক—না তা ভাগ করা যায়, না তাতে কোনো গুণ রয়েছে। কর্মগত এভাবে একক—তার কোনো অংশীদার নেই। সুতরাং না তার সত্তা ব্যতীত কোনো চিরস্থায়ী অস্তিত্ব আছে, না তার কোনো অংশীদার আছে। কারণ, দুটি চিরস্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত : আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করতে পারেন। নিজ সৃষ্টির উপযুক্ত ভেবে তিনি যা করেন, সেটাই ন্যায়। এর বিপরীত কিছু করা জুলুম। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কোনো কাজেই জুলুম নেই।

মুতাজিলা : আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক কাজ বান্দার আকল অনুযায়ী। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সকল কাজ মানুষের আকলে 'সঠিক' হওয়া জরুরি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত : আল্লাহ তাআলার কালাম চিরন্তন। সেখানে যা ভালো বলা হয়েছে, তা করলে সওয়াব হবে এবং যে বিষয়ে শাস্তির ধমকি দেওয়া হয়েছে, তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জ্ঞান এবং আকলের ভালোমন্দের সেখানে কোনো জায়গা নেই।

মুতাজিলা : একসময় তো আল্লাহর কালাম ছিলই না। আর আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ করেছেন, শাস্তির কথা শুনিয়েছেন—এগুলো তার কালামে

বলেছেন। সুতরাং যে নাজাত পেয়েছে নিজ কর্মে মুক্তি পেয়েছে। যে শাস্তি পেয়েছে তা-ও নিজ কর্মে। আর সেই কর্মগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে আকলের মাধ্যমে।

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাত : বান্দা ইবাদতের যত নির্দেশ পেয়েছে, সব কিছুর মূল কুরআন ও হাদিস। আকল শুধুমাত্র সেগুলোর পরিচায়ক। সুতরাং আকল কোনো ভালো কিংবা মন্দ নির্ধারণ করতে পারে না। ফরজ-ওয়াজিব নির্ধারণ করতে পারে না। শুধুমাত্র কর্মের পরিচয়ে আকলের প্রয়োজন পড়ে।

মুতাজিলা : সম্পূর্ণ এর বিপরীত। অর্থাৎ, কুরআন-হাদিস শুধু পরিচায়ক। আকলই ভালোমন্দের মূল।

লক্ষ কর, আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে শুরু করে ভালোমন্দ, আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকাম সব কিছুর বিচার ভার তারা নিজেদের আকলের ওপর দিয়ে রেখেছে। জমহুর উলামায়ে কেরাম সেজন্য তাদের বাতিল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আকল এবং মনুষ্য দর্শনের ওপর।

আচ্ছা চল মূল আলোচনায় ফিরি। পশ্চিমাদের কারসাজি দেখি খানিক।

পশ্চিমাদের মতে ১৪৫৩ সন তথা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগের শুরু হয়। পশ্চিমা সভ্যতা তখন খ্রিষ্টধর্মীয় পোপতান্ত্রিক সভ্যতাকে দূরে ঠেলে পূর্বের গ্রিক-রোমান সভ্যতাকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করে। মানবতাবাদকে সামনে রেখে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগ শুরু হয়। মনুষ্য প্রবৃত্তিকে সব কিছুর মানদণ্ড মানা হয়। যেমনটা মুতাজিলা সম্প্রদায় মানত। এই সময়টাকে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগও বলে থাকে পশ্চিমা বিশ্ব। ষোড় শ শতাব্দীতে এসে মানুষ খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বের হতে শুরু করে। ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন গড়ে তোলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষতক মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—মনুষ্য প্রকৃতি নির্ভর করে জড়পদার্থের ওপর। তাই মানুষের সব কিছুই হবে জড়পদার্থকেন্দ্রিক। আর সেজন্য বলা হলো, যুক্তিই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। মানুষের যুক্তিতে উন্নীত সব কিছু সঠিক। কোনো কিছু ভালোমন্দের বিচার করতে হলে যুক্তি যে দিককে সত্যায়ন করবে, সেটাই সঠিক; যা সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ‘যুক্তিবাদ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। স্যার আইজেক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭),

রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), বারুখ স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), গটফ্রিড লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬), ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) প্রমুখের কল্যাণে যুক্তিবাদ মানুষের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

যুক্তিবিদ্যার এই সূক্ষ্ম পাঠের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়—মনুষ্য জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা শূন্যের কোটায়। সুতরাং ধর্মের তৈরি বিধিনিষেধ মানারও কোনো প্রশ্ন আসে না। কেননা, ভালোমন্দ সব কিছু নির্ভর করে যুক্তির ওপর, মনুষ্য মস্তিষ্কের ওপর। এভাবে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা ধর্মকে জীবন থেকে পৃথক করে ফেলে।

মস্তিষ্কের এই খেলাটাকেই মুতাজিলা সম্প্রদায় চেয়েছিল নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ করে রাখতে। তাই তারা ইসলামকে সে হিসেবে বিচার করেছে। তারা চেয়েছিল দর্শনকে কষ্টিপাথর বানিয়ে ইসলামকে তাতে ঘষতে। পরিণামে তারা ইসলাম থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে।

চল আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যাই!

নাজনিন : বেল তো বেজে গেল—এখনো তো 'ইসলামি গণতন্ত্র' বা গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কেন কোনো সম্পর্ক নেই—এসব নিয়ে কিছুই বললি না।

মেহরিমা : হাঁ। যাইহোক, আজ আর সময় যেহেতু নেই, তাই আজকের আলোচনা এই যুক্তিবিদ্যা পর্যন্তই থাকল। পরে অন্য কোনো সময় বাকি আলোচনা শেষ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ দিন

চল, লাইব্রেরি হয়ে যাই!

মেহরিমার কথায় সায় দিয়ে নুজাইরা ও নাজনিনও লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ায়। হাজারো বইয়ের বিশাল এক সংগ্রহশালা এই লাইব্রেরিটা। থরে থরে সাজানো নানা বিষয়ে নানা মুনির নানা কর্ম। এখানে এলে বাগদাদের ঐতিহাসিক লাইব্রেরি আল হিকমাহর কথা মনে পড়ে যায় মেহরিমার। মোঙ্গলরা যে লাইব্রেরির বইগুলো